

Subject : Bengali
M.Phil 2nd Semester
Paper : I (Sahityer Itihas)
Paper No. : BNG 211
Unit : IV (Bangla Katha Sahityer Itihas)
Topic : Abu Ishaker Uponyas

বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন-চর্যা ও আবু ইসহাকের উপন্যাস

মহর্ষি সরকার

ধর্ম সম্বন্ধে বাংলাদেশের মানুষ বেশ সংবেদনশীল। তাই দেখা যায়, যে যুগে যে ধর্ম বাংলাদেশে এসেছে, এঁরা সেই ধর্মকেই গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। মূলত, ধর্মের প্রতি বাঙালির অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাসই তাঁদেরকে এত নিষ্ঠাবান হতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই ভক্তি ও বিশ্বাসের অনুকূলে যদি যুক্তি ও জ্ঞানের সমর্থন না থাকে তবে তা নিশ্চিতভাবে অজ্ঞতা ও অন্ধত্বে পরিণত হয়। বাংলাদেশে বিশেষত গ্রাম বাংলায় বিজ্ঞান চিন্তার একান্ত অনগ্রসরতার কারণে সবকালেই অলৌকিকতা ও আধিদৈবিকতা এখানকার মানুষদের গভীরভাবে আলোড়িত করেছে।^১ বাংলাদেশের উপন্যাস [আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) ও *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬), সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী খেনেড*, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের *লালসালু*, *চাঁদের অমাবস্যা*, *কাঁদো নদী কাঁদো*, শহীদুল্লা কায়সারের *সংশ্লুক* ইত্যাদি] থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের যে কয়েকজন উপন্যাসিকের লেখায় গ্রামবাংলার মানুষদের সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন-চর্যার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসিক আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মূলত, গ্রামবাংলার মানুষদের মূল্যবোধ-বিশ্বাস-সংস্কার লালিত জীবনের ছবি অত্যন্ত শিল্পনিপুণতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। তাঁর *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) ও *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬) হল সেই ধরনের দুটি উপন্যাস যার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারের ধরণ নির্ণয় করা যায়।

দুই.

আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫)-তে পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর সরল প্রাণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চাষিদের একটি জীবনচিত্র আঁকা হয়েছে। উপন্যাসটি আসলে স্বামী পরিত্যক্তা ও যুদ্ধ-মহত্তর বিধ্বস্ত এক সংগ্রামশীল জননী জয়গুণের দুঃখ কষ্টের মানচিত্র। পঞ্চাশের মহত্তরে যে মানুষেরা শহরে গিয়েছিল তারা আবার গ্রামে ফিরে আসে। ‘দুটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে জয়গুণও গ্রামে ফিরে আসে’।^২ যে ভিটে ছেড়ে তারা শহরে গিয়েছিল মহত্তরের সংকটে সে বাড়ি আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। শহর থেকে বিতাড়িত জয়গুণ ও তাঁর নাবালক ভাইপো শফী’র জন্য আছে একটা ছাড়া ভিটে বাড়ি- সূর্য দীঘল বাড়ি। পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারী বলে এ বাড়ির নাম সূর্য দীঘল বাড়ি। লোকের ধারণা এ বাড়িতে মানুষ টিকতে পারে না। যে বাস করে তার বংশ লোপ পায়। এই বাড়িতে বাস করার ফলে বংশ লোপ পেয়েছে এরকম অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে গ্রামের মানুষদের মধ্যে। এ গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে সূর্য দীঘল বাড়ির গাছপালার ডালে ভূত-পেত্নির আড্ডা।

বস্তুত, এসব কথা শফী'র মা আর জয়গুণও বিশ্বাস করে। তাই ছেলে-মেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কা করে এ বাড়িতে থাকার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই সময় এ বাড়িকে কেন্দ্র করে জয়গুণের যে ভয় তাকে পুঁজি করল এক 'নামকরা ফকির' জোবেদালী। বাড়ির চারকোণে চারটে তাবিজ পুঁতে এসে সে জানিয়ে দেয়— 'এইবার চউখ বুইজ্যা গিয়া ওঠ বাড়িতে। আর কোন ভয় নাই। ধুলা পড়া দিয়া ভূত-পেত্নীর আড্ডা ভাইঙ্গা দিছি।'^৩ এর বিনিময়ে সে পায় শফী'র মার ভিক্ষার বুলি খালি করে সোয়াসের চাল, জয়গুণ দেয় সোয়া পাঁচ আনা পয়সা আর বাঁশ ঝাড়ের একজোড়া বাঁশ। ফকির অবশ্য চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত করে দেয় না তাহলে তার রোজগারের চিরস্থায়ি সুযোগটা থাকে না। সে বলে—

হোন আর এক কথা। বচ্ছর বচ্ছর কিন্তু পাহারা বদলাইতে অইব। যেই চারজন এইবার রাইখ্যা গেলাম,
হেইগুলো কমজোর অইয়া যাইব সামনের বচ্ছর। বোঝতেই পার, দিনরাইত ভূত-পেত্নীর লগে যুদ্ধ করা কি
সোজা কাণ্ড !^৪

বস্তুত, ফকিরের প্রতি গ্রামের মানুষের এই বিশ্বাস আজও আছে।

জয়গুণের হাঁসে ডিম পাড়লে তার মেয়ে মায়মুন ভাবে, সেই ডিমে সে বাচ্চা তুলবে, আর তার ছেলে হাসু ভাবে, ডিম সে খাবে। কিন্তু জয়গুণ তো জানে ক্ষেতের ধান, গাছের ফল, হাঁস-মুরগির ডিম এইসব ভোগের প্রথম অধিকার হচ্ছে মসজিদের মোল্লার। আর এই সংস্কারের বশবর্তী হয়েই জয়গুণ হাসুকে সেই প্রথম দিনের ডিম দুটি জুম্মার ঘরে দিয়ে আসবার অনুমতি দেয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের যে বিশেষ প্রাধান্য ছিল তা আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই। আর সেই কারণে সমাজে মেয়েদের থেকে ছেলেদেরকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। এমনকি প্রবাদেই বলা হয়েছিল=

পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।

কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ।^৫

সমাজের এই বিশেষ সংস্কার ও নীতি নির্দেশ মেনে জয়গুণের তিন বছরের ছেলে কাসু রয়ে গেলো করিমবক্শের কাছে, আর মায়মুন ও কোলের মেয়েটির জায়গা হলো পরিত্যক্তা মায়ের কোল।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া তাদের সবসময় পর্দার আড়ালে রাখার চেষ্টা করা হতো। তাই দেখা যায়, জয়গুণ তার ঘরের প্রথম দিনের চারটি ডিম তার ছেলে হাসুর হাত দিয়ে মসজিদের মোল্লার কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি সেগুলিকে 'বেপর্দা আওরতের চীজ' বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ জয়গুণ ট্রেনে করে চাল নিয়ে এসে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে এবং সকলেই তার মুখ দেখতে পাই। পুথিতেও বলা ছিল-

মুখের ছুরত যার পুরুষে দেখিবে
বিছা, বিচ্ছু, জেঁক তারে বেড়িয়া ধরিবে।
যে চুল দেখিবে তার পুরুষ অচিন,
সাপ হইয়া দংশিবে হাশরের দিন।
যে নারী দেখিবে পর পুরুষের মুখ
শকুনি গিরিধিনী খাবে ঠোকরাইয়া চোখ।^৬

পুথির এই ছড়া থেকেই আমরা সেই সময় সমাজে মোল্লা তন্ত্রের প্রভাব ও তাঁদের তৈরি নানাবিধ সংস্কারের ছবি খুঁজে পাই।

ভূতের ভয়ে গ্রামের মানুষ যে কতটা ভীত তার প্রমাণ যেমন আমরা এই উপন্যাসে পাই তেমনি চিকিৎসার ক্ষেত্রে ফকিরদের ওপর আস্থার দিকটিও দেখতে পাই। তাই দেখা যায়, করিমবক্শের ব্যবস্থাপনায় তার ছেলে কাসু ভীত হয়ে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সকলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে কাসুকে ভূতে ধরেছে। চিকিৎসা চলে ফকিরের পদ্ধতিতে। যে চিকিৎসা মধ্যযুগীয় কূপমন্ডকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। করিমবক্শকে ফকির তার কৃতিত্বের কথা শোনায়। কত ভূত-পেত্নী সে তার শিখানের নীচে কবর দিয়ে রেখেছে। ফকিরের প্রতারণার অত্যন্ত বাস্তব এক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে। ভূতে পাওয়া কাসুকে ভূত ছাড়ানোর অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ মানুষের মনে যে প্রবল অন্ধত্বের বাস তার পরিচয়টি ভালোভাবে ফুটে ওঠে। প্রবঞ্চক ফকির তার চেলা ওপর ভূতের আছর আনে। অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ভূত কাসুকে ছেড়ে চলে যায়। ভন্ড ফকিরের কেলামতিতে অশিক্ষিত, অজ্ঞ করিমবক্শ ও গ্রামবাসী অবাক হয়ে যায়। ফকিরের নির্দেশে কাসুকে সাত পুকুরের জল এনে ‘গোসল’ করাতে হবে। করিমবক্শ একটু দ্বিমত করে, ‘গোসল! এই জ্বরের মইদ্যে?’^৭ ফকির দিদার তখন বোঝায় যে, জ্বর তো নেই, ভূতগুলি আগুনের তৈরি বলে কাসুর শরীর গরম হয়েছে।

উপন্যাসের একদম শেষ দিকে করিমবক্শ যখন জয়গুণের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে ফকিরের মন্ত্রপুত গজাল পুঁতে দিয়ে আসতে যায় তখন আমরা গ্রামীণ মানুষের সংস্কারের ছবিটি আরও একবার ফুটে উঠতে দেখি। সেই সঙ্গে করিমবক্শের হত্যার মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ মানুষের মনে ভূতের প্রতি ভয় ও বিশ্বাসের ছবিটিকেও আরও একবার আমাদের সামনে ধরা দেয়।

গ্রাম বাংলায় ভূত-পেত্নীর বিশ্বাস এক সার্বজনীন বিষয়। এরা আধুনিক চিকিৎসার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয় ফকিরের কেলামতিকে। এইভাবে ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’-র মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক গ্রামীণ মানুষের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে অসাধারণ শিল্প নিপুণতার সাথে প্রকাশ করেছেন।

তিন.

আবু ইসহাকের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘পদ্মার পলিদীপে’-ও (১৯৮৬) সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ মানুষের জীবন-চর্যার ছবি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসে আমরা দেখি, কোনো কাজ শুরু করার আগে ভগবানের নাম উচ্চারণ করা গ্রামীণ মানুষের এক বিশেষ সংস্কার হয়ে আছে। তাঁদের বিশ্বাস ভগবানের নাম নিয়ে কাজ শুরু করলে কাজে সফলতা আসে। আর তাই পদ্মার চর দখলের নিশানা হিসাবে বাঁশের খুঁটি পতার আগে এরফান মাতব্বর তার ছেলে ফজলকে ডেকে বলে—

অ ফজু, এইবার ‘আল্লাহ আকবর’ আওয়াজ দে।^৮

এরপর ফজল গলার সবটুকু জোর দিয়ে হাঁক দেয় ‘আল্লাহ আকবর’। গ্রামীণ মানুষের এই বিশ্বাস কিন্তু আজও দেখা যায়।

ভগবানের প্রতি গ্রামীণ মানুষের এই অগাধ বিশ্বাসের পাশাপাশি তারা এটাও মনে করেন যে, ভগবান হলেন সকল প্রকার বিপদ-আপদ, বাধা-বিপত্তির রক্ষাকর্তা। তাই তাঁর নাম নিলেই এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আর তাই চরদখলের অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী জঙ্গুরুল্লা যখন আরশেদ মোল্লার কন্যা রূপজানকে বশ করার জন্য পীরবাবার মন্ত্রপুত জিলিপি ও তেলের শিশি আরশেদ মোল্লার হাতে দেয় তখন সাবধান করে দিয়ে বলে—

বিছমিল্লাহ বুইল্লা-থুরি না না বিছমিল্লাহ কওনের দরকার নাই। বিছমিল্লাহ কইয়া মোখে দিলে বেবাক বিষ পানি অইয়া যায়। যাদু টোনার মন্তর-তন্তর ফুঙ্কা অইয়া যাইতে থাকে বোঝালা মিয়া? ^৯

গ্রামীণ মানুষের এই ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি তাঁদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারেরও বেশ কিছু পরিচয় আমরা এই উপন্যাসে পাই। আমরা দেখি ফজলের স্ত্রী রূপজানকে বশে এনে পীরবাবার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তুকতাকের ব্যবস্থা করে জঙ্গুরুল্লা। আর তাই সে রূপজানের বাবা আরশেদ মোল্লাকে পীরবাবার মন্ত্রপুত জিলিপি ও তেলের শিশি দিয়ে বারবার পীরবাবার নাম স্মরণ করিয়ে দেবার কথা বলেছে। জঙ্গুরুল্লার কথামতো কাজ হয়েছে, কিন্তু-

পীরবাবার তুকতাকে রূপজানের মন টেলেনি শুনে ভাবনায় পড়ে জঙ্গুরুল্লাও। আরো কড়া, আরো তেজালো বশীকরণ মন্ত্র নিশ্চয়ই জানা আছে পীরবাবার। ^{১০}

গ্রামীণ মানুষ পীরবাবারকে ‘আল্লার দূত’ বলে মনে করে। তাই তাঁর সেবা করার জন্য সবাই মুখিয়ে থাকে। এমনকি জঙ্গুরুল্লাও তাই করে। তাই আরশেদ মোল্লা পীরবাবার বয়সের কথা বলতেই জঙ্গুরুল্লা বলে ওঠে—

আরে তুমি রাখো ঐ কথা। উনি অইলেন আল্লাওয়াল্লা মানুষ। উনারা এত ত্বরাতরি বুড়া অন না। দেখোনা কেমন নূরানি চেহারা। ^{১১}

গ্রামীণ পুরুষতান্ত্রিক মুসলমান সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেই পুরুষদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এই বিশ্বাস ও সংস্কার মানুষের মনে বদ্ধমূল ছিল যে, পুরুষরাই একমাত্র ‘তালাক’ দেওয়ার অধিকারী। সেখানে মেয়েদের কোনো অধিকার নেই। তাই উপন্যাসে দেখি, ফজলকে দুবারই তালাক দিতে বাধ্য কড়া হয়েছে। দ্বিতীয়বারের বেলায় ফজলের গলায় পাওয়া গিয়েছে অনুযোগের সুর—

রাজী না, তয় তারেই (রূপজান) তালাক দিতে কোন। আমি দিমু না।’ ^{১২}

তখন জঙ্গুরুল্লা বলে—

আরে মাইয়ালোকে তালাক দিতে পারলে কি আর তোরে জিগাইতাম ! ^{১৩}

এই কথার মধ্যেই সমাজে পুরুষদের প্রাধান্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেই সময় গ্রামীণ সমাজে ‘ঘর দেখে বউ’ ও ‘বর দেখে মেয়ে’ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সাধারণ মানুষও তা বিশ্বাস করতো। এমনকি গাঁয়ের একটা প্রবাদও প্রচলিত ছিল-

বউ আনো ঘর দেখে

মেয়ে দাও বর দেখে। ^{১৪}

বস্তুত, এর অন্যথা হলে সেই সংসারে দুঃখ অনিবার্য ছিল যেমনটি ঘটেছিল এরফান মাতব্বরের সংসারে। যদিও এরফান মাতব্বর নিজের কৃতকর্মের সমর্থনে বলে-

বিয়ার আসল জিনিস অইল বউ। বউডা তো রূপে-গুণ, চলা-চলতিতে ভালোই আছিল। ^{১৫}

গ্রামীণ মানুষ এই বিশেষ ধরণের সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন সেই সময়।

গ্রামীণ সমাজের প্রান্তিক মুসলমান ঘরের মেয়েরা এক বিশেষ ধরণের কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিলেন। মূলত, তারা পাপবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তারা ‘শরীরের গুনা’, ‘মনের গুনা’, ‘চোখের গুনা’ মাপ করে দেওয়ার জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা জানায়। বস্তুত, তারা দোজখ ও বেহস্তে বিশ্বাসী। তাই ফজলের সঙ্গে তাঁর তালাকপ্রাপ্ত প্রথম স্ত্রী জরিনার অবৈধ শরীর সম্পর্কের পর মনে হয়েছে—

সে সবচেয়ে বড় গুনাগার। শরীরের গুনা, মনের গুনা, চোখের গুনা সে করেছে। অন্য সব গুনা মাফ হলেও হতে পারে, কিন্তু শরীরের গুনা কবিরাগুনা। এ গুনার মাফ নেই। সে শুনেছে, সাড়া জীবন ধরে আল্লার নাম জপ করলেও শরীরের গুনার শাস্তি থেকে কেই রেহাই পাবে না। আর কি সাজঘাতিক সে শাস্তি। দুই সাপ এসে কামড়ে ধরে দুই স্তন।^{১৬}

গ্রামীণ সমাজের প্রান্তিক মুসলমানদের জিন-পরীদের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। তারা মনে করে—

জিনের কথা কোরান শরীফে লখা আছে।... কিন্তু জিন কি, কেমন, কোথায় থাকে তার কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই। কোরান শরীফের একজন অনুবাদক তাঁর টীকায় লিখেছেন- কোরান শরীফের কোন কোন আয়াতে জিনের উল্লেখে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় ‘সুচতুর বিদেশী’ বোঝবার জন্য জিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।”^{১৭}

তাই দেখা যায়, বগাদিয়ার কলশরিক কোরবান ঢালীর পুতের বউ সবুরণ খুব সকালে নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ফিরে না আসায় অনেকের মনে অনেক রুম কৌতূহল হয়েছিল। কিন্তু একদিন একরাত পর ভোরবেলা যখন তাকে সেই একই নদীর ঘাতে পাওয়া গেলো তখনবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সবুরণ তখন ছিল সম্মহিত, বাহাজ্ঞানশূন্য, বাকশক্তিহীন। আর তাই সকলের মনে হয়েছিল যে মেয়েটির ওপর জিনের দৃষ্টি পড়েছে এবং জিনই তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। পরে লোকমুখে শোনা যায়—

সবুরণের শরীরে, শাড়ি ব্লাউজে মন-মাতানো খোশবু। সে নাকি জিন-পরীর দেশ কোহকাফ-এর খোশবুর নহরে ডুব দিয়ে এসেছে।^{১৮}

যদিও ফজলের মুখ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইংরেজ সাহেবদের দ্বারা কামনা ও ভোগের শিকার হয়েছিল সবুরণ এবং সেই সাহেবেরা যে সুগন্ধি দ্রব্য শরীরে মেখেছিল তারই সুগন্ধ লেগেছিল সবুরণের শরীরে, কোনো জিন-পরীর দেশে সে যায়নি।

সুতরাং দেখা গেল, গ্রাম বাংলায় ভুত-পেত্নি, জিন-পরী, ফকির-পীর-বাবাদের প্রতি বিশ্বাস এক সার্বজনীন বিষয় এখনকার মানুষেরা এইসব বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়। যাইহোক, ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক তাঁর *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) ও *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬) এই উপন্যাস দুটির মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন গ্রামীণ মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্ম বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন তেমনি অন্যদিকে গ্রামীণ মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনচর্যার ছবিও শিল্প নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, আর এখানেই তাঁর সার্থকতা।

তথ্যসূত্র

১। খোন্দকর শওকত হোসেন, *বাংলাদেশের উপন্যাস গ্রামীণ সমাজ*, দ্বিতীয় সংস্করণ- কলিকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ৭১।

২। আবু ইসহাক, *সূর্য দীঘল বাড়ী*, জুন ২০০১, চিরায়ত প্রকাশন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা. ১০।

৩। ঐ, পৃষ্ঠা. ১২।

৪। ঐ, পৃষ্ঠা. ১২।

৫। ঐ, পৃষ্ঠা. ২৩।

৬। ঐ, পৃষ্ঠা. ২২।

৭। ঐ, পৃষ্ঠা. ১০২।

৮। আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, এপ্রিল ১৯৮৬, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ৩৮।

- ୯। ଶ୍ଵେ, ପୂର୍ଣ୍ଣା. ୧୧୦।
୧୦। ଶ୍ଵେ, ପୂର୍ଣ୍ଣା. ୧୧୧।
୧୧। ଶ୍ଵେ, ପୂର୍ଣ୍ଣା. ୧୧୪।
୧୨। ଶ୍ଵେ, ପୂର୍ଣ୍ଣା. ୧୧୫।
୧୩। ଶ୍ଵେ, ପୂର୍ଣ୍ଣା. ୧୧୫।
୧୪। ଶ୍ଵେ, ପୂର୍ଣ୍ଣା. ୧୧୬।
୧୫। ଶ୍ଵେ, ପୂର୍ଣ୍ଣା. ୧୧୬।
୧୬। ଶ୍ଵେ, ପୂର୍ଣ୍ଣା. ୧୧୭।
୧୭। ଶ୍ଵେ, ପୂର୍ଣ୍ଣା. ୧୧୭-୧୧୮।
୧୮। ଶ୍ଵେ, ପୂର୍ଣ୍ଣା. ୧୧୭।